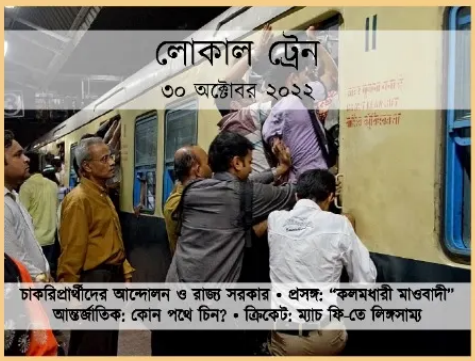

চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম
একটি ব্যতিক্রমী ওয়েবপত্র

এই যন্ত্রনির্ভর সভ্যতাকে ত্যাগ না করলে পৃথিবী ও মানুষের বাঁচা অসম্ভব

May 1, 2020 চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম অশনিসঙ্কেত 10

দেবল দেব

লেখক বিজ্ঞানী, কৃষিবিশেষজ্ঞ, সংরক্ষণবাদী। ইকোলজি বিষয়ে

পত্রিকার ই-মেইল গ্রাহক হোন...

নীচের বক্সে আপনার ই-মেইল ঠিকানা দিন এবং নতুন লেখা বেরোলে তার খবর জানুন...
Join 12,143 other subscribers.
ই-মেইল ঠিকানা
সাবস্ক্রাইব

অনুসন্ধান কেন্দ্র

SEARCH ...

লেখক ও বিষয়

বেছে নিন

পরিবেশ ও পুঁজিতন্ত্র

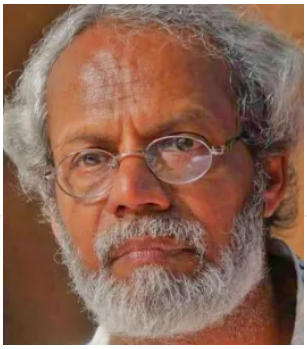

আন্তর্জাতিক মানের গবেষণায় রত। গত পঁচিশ বছর ধরে ১৪২০ প্রজাতির বিরল ধানের বীজ সংরক্ষণ করেছেন। ভারতবর্ষের Seed Warrior।

আমাদের দেশ সহ সারা বিশ্বজুড়ে নানা দেশে লকডাউন চলছে। এই দেড়-দুমাসের লকডাউনের মধ্যে আমরা অনেকেই একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটতে দেখছি। আমরা দেখছি যে প্রকৃতি নিজেই নিজের ক্ষতগুলির শুশ্রূষা করে নিচ্ছে। সারা পৃথিবীতে কার্বন ফুটপ্রিন্ট উল্লেখযোগ্যরকম কমে গেছে। সুমেরু অঞ্চলে বায়ুমণ্ডলে ওজোন স্তরে যে বিশাল ফুটো হয়েছিল, তা নিজে থেকে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। যে হাওয়ায় আমরা শ্বাস নিচ্ছি তা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি নির্মল। আকাশ অনেক বেশি স্বচ্ছ, সুনীল। আমাদের আশেপাশের যে বিপুল প্রাণিজগৎ যাদের অস্তিত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে আমরা মানুষেরা কোনওদিনই ঠিকঠাক সচেতন ছিলাম না বা আজও নই, আজ তাদেরই আমরা আমাদের আশেপাশে ঘুরতে ফিরতে দেখছি। কলকাতার ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের খালের ধারের রাস্তায় এই সময় ভাম ও বেজিদের দেখা যাচ্ছে। রাতে হরিদ্বারে দল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে বারসিঙা হরিণ। ভেনিসের পরিত্যক্ত গন্ডোলায় আবার দেখা যাচ্ছে ডলফিনদের। কদিন আগে অবধি দিল্লিতে যমুনার জলে পা রাখলে আমাদের চর্মরোগ হতে পারত, আজ তার জলই এতখানি উজ্জ্বল নীলবর্ণ যে আমাদের মনে পড়ে যাচ্ছে মীরার সেই ভজনের কথা— “চল মন গঙ্গা-যমুনা তীর, গঙ্গা-যমুনা নিরমল পানি”। কলকাতায় রাতের আকাশে স্বাতী নক্ষত্র, আকাশগঙ্গা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, যা কদিন আগেও ধোঁয়া-ধুলো-দূষণে ঢেকে থাকত। অর্থাৎ এই আশ্চর্য ঘটনাগুলি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে মানুষের এই যন্ত্রনির্ভর সভ্যতা না থাকলে প্রকৃতি স্বাভাবিকভাবেই কতখানি সুস্থ ও সুন্দর হতে পারত। কারণ মাত্র এক-দেড়মাসেই প্রকৃতি দেখিয়ে দিল সে কত দ্রুত নিজেকে সারিয়ে তুলতে পারে।

ষষ্ঠ বর্ষ | পঞ্চম মেল ট্রেন | অক্টোবর, ২০২২ | সূচিপত্র

স্টেশন মাস্টারের টেবিল

স্মরণ
- **রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য**
  - **কণিষ্ক চৌধুরী**
  - **দেবাশিস ভট্টাচার্য**

রিজার্ভড বগি : জঁ লুক গোদার: অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে
- **সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়**
- **মৈনাক বিশ্বাস**
- **সায়ন্তন দত্ত**
- **মহাশ্বেতা আচার্য**
- **পিটার ব্র্যাডশ**

স্টিম ইঞ্জিন
- **রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য**

বিশেষ নিবন্ধ ও সাক্ষাৎকার
- **কণিষ্ক চৌধুরী**

সবুজ স্লিপার
- **সোমনাথ মুখোপাধ্যায়**

কবিতা কর্নার
- **নিরুপম চক্রবর্তী**
- **ফেরদৌস নাহার**
- **শুভদীপ চক্রবর্তী**
- **অর্কপ্রভ ভট্টাচার্য**
- **সৌরভ ভট্টাচার্য**

গল্পের কামরা
- **প্রবুদ্ধ বাগচী**
- **অভি বিশ্বাস**
- **ইশরাত তানিয়া**
- **শুভ্রদীপ চৌধুরী**
- **যুগান্তর মিত্র**

প্রবন্ধের ক্যুপ
- **আশীষ লাহিড়ী**
- **স্বপন কুমার ঠাকুর**
-

এই ছবিগুলো দেখে, খবরগুলো শুনে আমরা আহ্লাদিত হচ্ছি বটে, কিন্তু বলাই বাহুল্য, এই বদলগুলো সাময়িক ও চূড়ান্ত ক্ষণস্থায়ী। লকডাউন উঠে যাওয়া মাত্রই, বিশ্বের ছোটবড় কারখানাগুলিতে পুরোদমে উৎপাদন শুরু হবে এবং পরিবেশের অর্জিত সুস্থতাগুলি হারিয়ে যেতে বিন্দুমাত্র সময় লাগবে না। ইতোমধ্যেই বিভিন্ন শিল্পমহল ঘোষণা করে দিয়েছে, লকডাউনের পর প্রতি সপ্তাহে ন্যূনতম ষাট ঘণ্টা অর্থাৎ দিনে দশ ঘণ্টা কাজ না করলে, এই কদিনে যে বিপুল ঘাটতি হয়েছে তা পূরণ করা যাবে না। আমার কাছে এই ঘোষণাটা ক্রোধ উদ্রেক করছে, কারণ এই বিজ্ঞপ্তিটা জারি হল মে দিবসেই— যে ঐতিহাসিক দিনে শিকাগোর শ্রমিকেরা প্রতিদিন কাজের সময় আট ঘণ্টায় বেঁধে দেবার দাবিতে আন্দোলন ও রক্তক্ষয় করেছিলেন।

আরও গুরুত্বপূর্ণ যে, এই ঘোষণাটিকে আমার-আপনার মতো সাধারণ মানুষ সমর্থনও করছেন। দেশের একটা বড় অংশের মানুষ ইতিমধ্যেই দুশ্চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছেন যে আদানি-আম্বানি যদি কারখানাগুলো না খোলে, তাহলে তো পরের মাস থেকে আর ঠিকঠাক মাইনে পাওয়া যাবে না। ইএমআই দেব কী করে? ঘরে নতুন আরেকটা এসি লাগাব কী করে? তাছাড়া কারখানা না খুললে, উৎপাদন না হলে দেশ উন্নত-ই বা হবে কী করে! কেউ একথা ভুলেও বলছেন না যে, কারখানা কম চললে বা রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা কম হলে পরিবেশ যদি এতখানি সুস্থ থাকে, তাহলে এটা নিয়েও ভাবনাচিন্তা হোক। আমরা একথা একবারের জন্যেও স্বীকার করছি না যে আমাদের ভোগ ও এই পাগলের মতো ‘আরও সম্পদ চাই, আরও দাও, লোককে আরও দেখাব’-টা জরুরি নয়, অনেক বেশি জরুরি পৃথিবীর সুস্থতা, মানবসমাজ সমেত সমস্ত প্রাণি ও উদ্ভিদ্-জগৎ নিয়ে এই যে বিপুল ও বৈচিত্র্যময় বাস্তুতন্ত্র— তার সুস্থতা।

অতএব আমাদের কোনওরকম আশাবাদী হওয়ার অবকাশ নেই। লকডাউন উঠলেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও তার কারখানাগুলি গত দেড়-দুমাসের ঘাটতি মেটাতে উৎপাদন বাড়ানোর দিকে এতখানি গুরুত্ব দেবে, যে পৃথিবীব্যাপী সুস্থ পরিবেশের আশা দুরাশাই থেকে যাবে। কারণ সভ্যতা এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে উন্নয়ন দরকার এবং উন্নয়ন মানেই আরও ভোগ, আরও ভোগ্যবস্তুর উৎপাদনের দিকে বাজার ও পুঁজির এক অন্তহীন ইঁদুরদৌড়, এই একমাত্রিক ভাবনাটি আমাদের

সকলের মনে গভীরভাবে গেঁথে গেছে। আমাদের শাসকেরাও তাই-ই ভাবেন, এবং সাধারণ মানুষ যারা ভোট দিয়ে শাসকদের নির্বাচিত করেন, তাদের ভাবনাটিও একই। ভাবনাটি এরকম— উন্নয়নের অভিমুখে এই তীব্র গতিবেগে যদি পরিবেশের বা বাস্তুতন্ত্রের একটু-আধটু ক্ষতি হয়, আমাদের তাও মেনে নিতে হবে। উন্নয়নের এই ধারণায় মানুষ বাদ দিয়ে অন্যান্য জীবপ্রজাতির কোনও উল্লেখ নেই, আর তাছাড়া মানুষের সভ্যতার অগ্রগমনের সমান্তরাল ক্ষতি হিসেবে যদি কিছু প্রজাতির জীববৈচিত্র্য লুপ্ত হয়ে যায়, তাও আমাদের মেনে নেওয়া উচিত। প্রকৃতির ধ্বংস, জীবনহানি, আর মানুষের স্বাস্থ্যহানি— সভ্যতার অগ্রগতির আবশ্যিক মূল্য। একটা পরিসংখ্যান দিলেই বিষয়টা পরিষ্কার হবে। আজ থেকে তিরিশ বছর আগে বিশ্বে জীবপ্রজাতির বিলুপ্তির হার ছিল হাজার বছরে একটা, অর্থাৎ প্রতি হাজার বছরে গড়ে একটি প্রজাতির জীব পৃথিবীর থেকে চিরতরে মুছে যাছিল। আজ, এই বছরে, সেই বিলুপ্তির হার এসে দাঁড়িয়েছে প্রতি দশ বছরে হাজারটা। তাতে অবশ্য আমাদের খুব একটা কিছু এসে যায় না। যারা বিলুপ্ত হচ্ছে তারা নানারকমের পোকা হতে পারে, কেঁচো হতে পারে, মাকড়শা বা অণুজীব হতে পারে। যতক্ষণ না একটু বড়সড় আকারের প্রাণি সঙ্কটে পড়ছে, আমরা সাধারণত ফিরেও তাকাই না। গত চার মাস আগেই একটা বিরল প্রজাতির গণ্ডার, 'সুমাত্রা গণ্ডার' মালয়েশিয়া থেকে চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেল। গণ্ডার যেহেতু একটা বড়সড় জন্তু, কিছু খবর বেরোল, আমরা জানতে পারলাম, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। অস্ট্রেলিয়ার দাবানলে অজস্র পশু মারা পড়েছে, তার মধ্যে কোয়ালার সংখ্যা এত নেমে গেছে যে, কিছুদিনের মধ্যে এই প্রজতিও বিলুপ্ত হবে। এছাড়াও যে প্রতিদিন একটি দুটি করে জীব হারিয়ে যাচ্ছে, তা নিয়ে আমাদের কারও কোনও মাথাব্যথা নেই। আর যদি আমরা কাউকে এই ঘটনার গুরুত্ব বোঝাতেও চাই, তারা বলবেন, উন্নয়ন হচ্ছে, দেশ এগোচ্ছে, তার একটা মূল্য তো দিতেই হবে। ওড়িশার নিয়মগিরিতে বা ছত্তিশগড়ে অ্যালুমিনিয়ামের জন্য যখন হাজার হাজার আদিবাসীদের উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়, তার পেছনেও কাজ করে একই যুক্তি। আদিবাসী বা প্রান্তিক মানুষেরাও মানবসমাজের পোকামাকড় বা অণুজীব, এদের জীবনের কোনও মূল্য নেই উন্নয়ন নামক বৃহৎ কর্মকাণ্ডের কাছে। অ্যালুমিনা না পেলে আমরা তো নতুন নতুন গাড়ি চড়তে পারব না, এসির হাওয়া খেতে পারব না, ফলে আমাদের

বৈভব ও বিলাসের জন্য কিছু পোকামাকড় বা আদিবাসী মরে গেলে কিছু আসে যায় না।

আমি এই মানসিকতাকে বলি 'developmentality' বা উন্নয়নমনস্কতা[1]। উন্নয়নটাই মডেল এবং সভ্যতার একমাত্র লক্ষ্য, এটা বিনা তর্কে মেনে নেওয়াটাই উন্নয়মনস্কতা। এটাই আমাদের দেশের প্রায় সমস্ত মানুষের মানসিকতা। যে রাজনৈতিক দল আমাদের বছরে তিরিশ লক্ষ চাকরির প্রতিশ্রুতি দেয়, তাকেই আমরা আমাদের ভোটটা দিয়ে আসি। চাকরি মানেই উন্নয়ন, এর বাইরে আমরা ভাবতে শিখিনি। রাষ্ট্র ও পুঁজি এরই মাঝে একটি মজাদার পরিভাষা বের করেছেন 'sustainable development'। এই কথাটা একটা অক্সিমোরন— বিরোধালঙ্কার। উন্নয়ন বলতে আমরা যদি শুধুমাত্র শিল্পোন্নয়ন, industrial growth বুঝি, সেই উন্নয়ন কখনও sustainable হতে পারে না। বিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী, এই মহাবিশ্বে কোনও কিছুর নিরন্তর বৃদ্ধি অসম্ভব ঘটনা। তা সত্ত্বেও, জেনেবুঝে Sustainable Development-এর অর্থনৈতিক মডেলটা বিক্রি করা হচ্ছে। এটা ধরেই নেওয়া হচ্ছে যে এর বাইরে অন্য কোনও কিছু হতে পারে না। আমি একে বলি TINA সিনড্রোম— There Is No Alternative। বাংলায় বলা যায় "কো-বি-নে" সিন্ড্রোম। উন্নয়ন যেভাবে চলছে, তার কোনও বিকল্প নেই। মানুষের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া গেছে, যা এতদিন ধরে চলে আসছে, যা আমরা দেখে এসেছি, এটাই একমাত্র পথ। চাষের ক্ষেত্রেই ধরা যাক, মানুষ ভাবতেই পারে না, ইউরিয়া-ডিএপি-কীটনাশক ছাড়া ধান চাষ হতে পারে, কারণ গত পঞ্চাশ বছর ধরে আমরা ইউরিয়া দিয়েই ধান চাষ করছি। মানুষ ভুলে গেছে, ইউরিয়া দেশে কবে এসেছিল এবং ধান পৃথিবীতে কবে এসেছিল। প্রায় বারো হাজার বছর আগে ভারতীয় ভূখণ্ডে ধান চাষ শুরু হয়েছিল আর দেশে 'সবুজ বিপ্লব'-এর পর অর্থাৎ সবেমাত্র ষাটের দশক থেকে ইউরিয়া ও কীটনাশকের ব্যবহার শুরু হয়েছে। অর্থাৎ গত চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের পেছনেও যে একটা বিশাল ইতিহাস আছে তা মানুষ ভুলে গেছে। ঠিক তেমনিভাবে, যন্ত্রনির্ভর সভ্যতার বয়স মেরেকেটে মাত্র দুশো বছর। অথচ তার আগে হাজার হাজার বছর ধরে মানবসভ্যতার যে দীর্ঘ ইতিহাস, তা সিন্ধু সভ্যতা হোক, বা মিশরীয় বা আজটেক সভ্যতাই হোক, যা বৃহৎ যন্ত্রনির্ভর সভ্যতা না হয়েও মানবপ্রজাতিকে ধারণ করেছিল এবং যথেষ্ট উন্নত ছিল, তাদের কথা আজ আমরা ভুলে গেছি। অবচেতনে আমরা বিশ্বাস

করি, দুশো বছর আগে ইওরোপের যন্ত্রসভ্যতা আসার আগে আমরা সবাই অসভ্য বর্বর ছিলাম। আমাদের সভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাস ও অবদান ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র যন্ত্রসভ্যতাকেই এক ও একমাত্র আশ্রয় এবং সভ্যতার একমাত্র লক্ষণ বলে ভাবাটাই আজ আমাদের ও আমাদের বাসস্থান এই পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্গতির কারণ।

অতএব লকডাউনের এই পরিবেশগত সুফল ক্ষণস্থায়ী। পরিবেশ এই সামান্য এক-দেড় মাসে যেটুকু সুস্থ হয়েছে, বিশ্বজোড়া উৎপাদন ব্যবস্থা আবার শুরু হওয়ার পরই তা মুছে যেতে আমাদের এক সপ্তাহও হয়তো লাগবে না। পরিবেশকে বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র উপায় এই যন্ত্রসভ্যতাকে পরিত্যাগ করা। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে আমাদের সামন্ততন্ত্রে ফিরতে হবে, বা গুহামানব হয়ে যেতে হবে। অনেকেই বলতে পারেন, যন্ত্রনির্ভর সভ্যতা ছাড়া কি আধুনিক মানুষ বাঁচতে পারেন? উদাহরণ হিসেবে আমি নিজের কথা বলতে পারি। গত পঁচিশ বছর ধরে আমি নিজের জীবনে এই বিকল্প দর্শনের চর্চা করে যাচ্ছি, তা নিয়ে লিখে যাচ্ছি। যেমন— সংক্ষেপে আমার ফার্মের বাড়ির কথাটাই বলি। ঐ বাড়িতে কোনও ভাটিতে পোড়ানো ইট ব্যবহার করা হয়নি। কারণ কোনও কিছু পোড়ানো মানেই আমি বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস নির্গত করব। আমার বাড়িতে আমি রোদে শুকনো ইট ব্যবহার করেছি। এই ইটকে অ্যাডবে (adobe) বলে। এই অ্যাডবে পৃথিবীর অতি প্রাচীন প্রযুক্তি ও বহু প্রাচীন সভ্যতায় এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে ঘরবাড়ি বানানো হত। বাড়িটিতে কোনও সিমেন্ট ব্যবহার করা হয়নি, কোনও প্লাস্টিক নেই, কোনও কাঠ নেই। শুধুমাত্র বাঁশ, খড়, মাটি, চুন ও বালি দিয়ে বাড়িটি তৈরি করা হয়েছে। বালি ও চুন দুটোই গ্রামে পাওয়া যায় বা তৈরি হয়। অর্থাৎ এই বাড়ি তৈরি করতে আমি বৃহৎ শিল্পজাত দ্রব্য বা Industrial product-কে সচেতনভাবে বর্জন করেছি। বাঁকুড়াতে তৈরি এই বাড়িটিই ছিল ভারতের প্রথম ও একমাত্র সচেতনভাবে তৈরি বাস্তুতন্ত্র-বান্ধব স্থাপত্য বা ecological architecture। একইভাবে আমি চব্বিশ হাজার লিটার বৃষ্টির জলকে মাটির ওপরেই ধারণ করা যায় এমন ব্যবস্থা করেছিলাম। মাটির নিচের রিজার্ভারে সাধারণত বৃষ্টির জল রাখা হয়, সেক্ষেত্রে আবার বিদ্যুৎচালিত পাম্প বা হ্যান্ড পাম্প ব্যবহার করে সেই জল ওপরে তুলতে হয়। আমি মাটির ওপরেই জল সঞ্চয় করে সম্পূর্ণভাবে সেই অতিরিক্ত শক্তির খরচ বাঁচিয়েছি। আজ থেকে সতেরো বছর আগেই শীতকালের

শিশির সঞ্চয় করে বিশুদ্ধ জল ধরতাম বোতলে। অজস্র মানুষ এসব প্রয়োগ দেখে গেছেন। গুজরাট, মহারাষ্ট্রের চাষিরা আমার বাড়িতে এসে এইসব দেখেশুনে দেশে ফিরে গিয়ে নিজেদের জায়গাতে তা প্রয়োগ করেছেন। বাংলার কেউ অবশ্য এসব প্রয়োগ করবার কথা ভাবেননি। বাংলায় দীর্ঘ ষোল বছর এবং তারপর ওড়িশায় এগার বছর ধরে আমি যে খামারবাড়ি তৈরি করেছি তাতে একবিন্দু গ্রিড ইলেকট্রিসিটি ব্যবহার করা হয় না, মাটির তলার জল ব্যবহার করা হয় না। সৌরশক্তি, বৃষ্টির জল, শিশিরের জল ব্যবহার করে রোজকার কাজ চলে। এই লেখায় এইসব ব্যক্তিগত উদাহরণ টেনে আনার কারণ হল, যন্ত্রসভ্যতার সাহায্য না নিয়েও যে স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন করা যায় তা প্রমাণ করা। আমি শুধু মুখে বলা বা লেখা নয়, জীবনযাপন ও দীর্ঘদিন ধরে হাতেকলমে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা দিয়ে বিষয়টি প্রমাণ করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। Sustainability-র মূল কথা হচ্ছে zero external input। কোনও শক্তি বা দ্রব্যকে বাইরের থেকে এনে ব্যবহার করা যাবে না। যতক্ষণ না ব্যবস্থাটি এমন হচ্ছে যে, তা চালিয়ে যেতে গেলে বাইরের কোনও ইনপুটের প্রয়োজন হচ্ছে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তা সুস্থায়ী নয়। ঠিক এইভাবে, জৈব চাষও sustainabale হতে পারে না যদি গোবরটা বাইরে থেকে কেনা হয়, বীজটাও বাইরে থেকে কিনতে হয়। জল তুলতে পাম্প চালাতে হয়। এমনকি তথাকথিত “জিরো বাজেট” ন্যাচারাল ফার্মিং-এ, প্রথমেই দুটো গরু কেনার কথা বলা হয়। কিন্তু বাইশ-পঁচিশ হাজার টাকা খরচ করে দুখানা গরু কিনলে তা আর “জিরো বাজেট” থাকে কী করে? সেকারণেই Sustainability-র মডেল হিসেবে আমরা জৈব চাষের থেকেও বেশি করে ইকোলজি-নির্ভর কৃষি বা এগ্রো-ইকোলজির উপরে জোর দিই। সেটা হাতে কলমে শেখাই।

অর্থাৎ এই ধ্বংসোন্মুখ বিশ্ব থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় এই তথাকথিত যন্ত্রনির্ভর জীবন ত্যাগ করে এক বিকল্প চিন্তাভাবনা ও জীবনদর্শনে উত্তরণ। বিশ্বের মানুষ এই TINA সিনড্রোম ত্যাগ না করলে এই পৃথিবী ও তার জীবজগতের বেঁচে থাকা অসম্ভব। আর তা করতে গেলে আমাদের অভিনব কোনও বিকল্প খোঁজার দরকার নেই, বিকল্প আমাদের আশেপাশে রক্তমাংসেই বর্তমান, অতীতে ফিরে যেতে হবে না, আমাদের আশেপাশে সমসময়েই আমরা সেই বিকল্পের সন্ধান পাব।

এই বিকল্প জীবনের দিকে আমরা যাব কিনা, TINA সিনড্রোম আমরা ছাড়তে পারব কিনা, তার ওপর নির্ভর করবে প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক আগামী দিনে কোন দিকে যাবে। এই লকডাউন আমাদের আরেকবার তা ভেবে দেখার সুযোগ দিল। তবে পাশাপাশি এটাও ঠিক, আমরা এমনটি ভাবব একথা বিশ্বাস করতেও পারছি না। প্রকৃতির এই রূপ নিয়ে আমাদের আহা-উহু নিছক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির অলস কল্পনাবিলাস ছাড়া কিছু নয়। এই লকডাউনের মধ্যেই অরুণাচল প্রদেশে আশি হাজার গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। কারণ সেখানে উন্নয়ন হবে। ছত্তিশগড়ে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার হেক্টর বনভূমিকে ডিনোটিফায়েড করে দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত তা আদানি গ্রুপের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে কালাহাণ্ডি জেলায় লাঞ্জিগড়ের কাছে ওড়িশা মাইনিং কর্পোরেশন দুটি আদিবাসী গ্রাম ও বনাঞ্চল থেকে গ্রামবাসীদের উচ্ছেদ করে দিয়েছে। এই জমি বেদান্ত অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানির ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের কাজে লাগবে। এ নিয়ে সংবাদপত্রে বিস্তারিত কোনও খবর নেই। কারণ সাংবাদিকেরা বাড়ি থেকে বেরোতে পারছেন না। কোর্ট বন্ধ। দমনপীড়ন চালানোর জন্য লকডাউনই উপযুক্ত সময়। কোভিডকেও শাসক নিজের সুবিধায় কাজে লাগিয়ে নিচ্ছেন। অতএব আসুন, লকডাউন কেটে গেলে আমরা আমাদের সমস্ত কল্পনাবিলাস ঝেড়ে ফেলে যন্ত্রনির্ভর সভ্যতা-নির্ধারিত উৎপাদনের জাঁতাকলে নিজেদের সঁপে দিই। কারণ আমাদের আরও বড় বাড়ি চাই, বাড়ির সবকটা ঘরে ঠান্ডা মেশিন চাই, আরও এসি গাড়ি চাই। আর পুঁজির নিয়মে এটাই তো উন্নয়ন। Sustainable Profit-ই আসলে Sustainable Development। প্রতিদিন আরও বেশি, আরও বেশি ভোগ্যবস্তু এবং মুনাফা না হলে পুঁজির চলবে কী করে! তাই দিনে দশ ঘণ্টা কেন, ষোল ঘণ্টার কাজ করেও গর্বিত থাকে আইটি-সেক্টরের ক্রীতদাসের দল। কারণ, তাদের যে একটা ফোন এবং এমনকি একটা ল্যাপটপও কোম্পানি দিয়ে দেয়, যাতে রাত-দুপুরেও বস্ চাইলেই, পরিসংখ্যান দিতে পারে। এই দাসেদের পিতামাতাও খুব খুশি থাকেন। তাঁরা চান না, আম্বানি বা বেদান্ত কোম্পানি বন্ধ হোক। বরং কোনও শিল্পের জন্য যদি আরেকটা বনের লাখখানেক গাছ কাটা পড়ে, সেটা তাঁদের কাছে বড় খবর নয়। এটাই উন্নয়নমনস্কতা।

---

[1] **https://www.routledge.com/Beyond-Developmentality-Constructing-Inclusive-Freedom-and-Sustainability/Deb-**

Norgaard/p/book/9781844077120

লেখাটি ভালো লাগলে ছড়িয়ে দিন...

Tweet Print WhatsApp Pin it More

Like this:

Loading...

কৃষি কোভিড ১৯ দেবল দেব পরিবেশ প্রকৃতি

আলোচিত লেখাগুলি...

পশ্চিমবঙ্গে নিয়োগ কেলেঙ্কারি: শেষের শুরু?
গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্যই বিদ্রোহ করা ন্যায়সঙ্গত
সরকারের উদ্দেশ্য কি সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাটাই তুলে দেওয়া?
সাইবাবা মামলা, আদালত, ন্যায়বিচার, মানবিক অধিকার— অমৃত, না গরল?
উঠ গো ভারতলক্ষ্মী

About চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম › 4007 Articles

ইন্টারনেটের নতুন কাগজ

« PREVIOUS
ডিজিটাল বৈষম্যের মহাসর্বনাশের মুখে নবীন প্রজন্ম

NEXT »
শিরদাঁড়া সোজা এক মানুষ ছিলেন ঊষাদি

8 COMMENTS

Rudra Kinshuk
MAY 7, 2020 AT 7:33 PM

Ai lekha amake bhabiye tulechhe.
Khub bhebe dekhar moto.

REPLY

nagorik dot news

MAY 7, 2020 AT 10:59 PM

চমৎকার লেখা

REPLY

techshouts

MAY 7, 2020 AT 11:00 PM

good write up

REPLY

জয়া মিত্র

MAY 8, 2020 AT 12:13 AM

ভালো লেখা। ড দেব একথা বহুদিন ধরে বলে আসছেন। ওঁর কথায় অনেকেই প্রভাবিত হয়েছেন। বাইরের জিনিস না এনে স্থানীয় উপাদানের ওপর নির্ভর করে সহজজীবনে বাঁচাই মানুষের ভালো থাকা ও ভালোরাখার একমাত্র উপায়।

REPLY

Najib Hossain Akash

MAY 8, 2020 AT 12:33 AM

কুরআনের একটা কথা মনে পরলো- ‘জাহারাল ফাসাদু ফিল বাররে ওয়াল বাহরে বিমা কাছাবাত আইদিন নাস’। অর্থাৎ জলে-স্থলে ফ্যাসাদ ভরপুর হয়ে গেছে লোকের কৃতকর্মের ফলে।
(হে লোক সকল) তোমদের ওপর বালা-মুসিবত যা কিছু নাজেল হয়ে থাক তা তোমাদেরই কর্মফলের দরুন। আল্লাহ তোমাদের অনেকের পাপ মার্জনা করে থাকেন (সূরা-শুরা)। বস্তুত নিশ্চয় আল্লাহ তা’লা কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় (সূরা-রাদ)।

REPLY

Bedangshu

MAY 10, 2020 AT 2:42 PM

আল্লা কিছুই করে না।

REPLY

Muzahid Ahmed

MAY 8, 2020 AT 3:42 PM

খুব ভালো লিখা। দেশ-দুনিয়া ও মানুষ থাকুক।

REPLY

সোমনাথ রায়

MAY 15, 2020 AT 8:13 AM

খুব দরকারি লেখা। আমরা বস্তুত একটা আন্টস্টেবল সিস্টেমকে বিশ্বাস করে আত্মপ্রবঞ্চনা করছি।
https://www.guruchandali.com/comment.php?topic=17365

REPLY

2 TRACKBACKS / PINGBACKS

🔗 এই যন্ত্রনির্ভর সভ্যতাকে ত্যাগ না করলে পৃথিবী ও মানুষের বাঁচা অসম্ভব (in Bangla) - Vikalp Sangam

🔗 এই যন্ত্রনির্ভর সভ্যতাকে ত্যাগ না করলে পৃথিবী ও মানুষের বাঁচা অসম্ভব (in Bangla) - Vikalp Sangam

আপনার মতামত...

Enter your comment here...